প্রেম একটি লাল গোলাপ

রশীদ করীম

ঐতিহ্য

‘প্রেম একটি লাল গোলাপ’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের ‘বিচিত্রা’—ঈদ সংখ্যায়।

বর্তমানে পুস্তক আকারে প্রকাশের সময় কোনোই পরিবর্তন করা হয় নি।

রশীদ করীম

এই কাহিনীর উদ্বোধন হচ্ছে ১৯৭৩ সালের এক সকালবেলা। সেখানে শুরু হলেও এই আখ্যানের প্রায় সব ঘটনাই পেছনে ফিরে দেখেছে— ছুঁয়ে গেছে তারও পূর্ববর্তী বছরগুলোকে।

এই রচনাটি প্রধানত রানুকে নিয়ে। রানুকে আমি চিনতাম। দেখা-সাক্ষাৎ যে খুব বেশি হয়েছে তা বলতে পারবো না। কিন্তু কী কারণে জানি না, ভিড়ের মধ্যেও আমাকে খুঁজে নিয়ে অলক্ষ্যে আমার পাশেই এসে বসেছে সে। খুব একটা কথা বলে না আমার সঙ্গে। চুপটি করে বসে থাকে এবং সহজে উঠে যায় না।

এমনি করে এক সময় রানুদের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ না হলেও অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। আমি অবিবাহিত; আমার প্রয়োজন সামান্যই। কলেজে অধ্যাপনা এবং মাঝেমধ্যে লিখে-টিখে দিনগুলো দিব্যি কেটে যায়। নারীদের প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ যে আমাকেও কোনোদিন আনমনা করে নি সেকথা বলতে পারবো না। তবু মেয়েদের কুহক থেকে আমি দূরেই থেকেছি। কোনো কোনো পুরুষের এমনই ভাগ্য যে সব দিক দিয়েই ভালোবাসার সবচাইতে উপযুক্ত পাত্র হয়েও, মেয়েদের ভালোবাসা আর তাদের কপালে জোটে না। আমি সেই হতভাগ্যদেরই দলে। এতদিন পর অবশ্য আমার এ নিয়ে তেমন আর কোনো ক্ষোভ নেই। তাদের অবহেলা সহ্য হয়ে গেছে—এবং সেই অবহেলা নিয়েই এই জীবনটাকে মোটের ওপর একটা সুখের ব্যাপারই মনে হয়।

রানু সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি— তার নিজের মুখেও অনেকটা। কিন্তু সেই সব ঘটনা যে মেয়েটির পরিচয় দেয় তার সঙ্গে আমি যে মেয়েটিকে দেখি তার বিশেষ কোনো মিল খুঁজে পাই না।

রানুর গানের গলা ছিল, এককালে গান গাইতে ভালোবাসতো। ঠিক কী কারণে জানি না, একদিন সে গান গাওয়া বন্ধ করে দিল। সেদিন থেকে কেউ আর তার গান শোনে নি; আমার বিশ্বাস, তার স্বামী শুনে থাকলেও খুব বেশি নয়।

রানু কিন্তু আমাকে গান শোনায়।

হঠাৎ কোনো এক বিকেলবেলা রানুদের বাড়িতে উপস্থিত হলে—এবং সেখানে আর কেউ না থাকলে রানু কার্পেটের ওপর একটা পরিষ্কার সুজনি বিছিয়ে, আমাকে তার ওপর বসিয়ে দেয়। আমাকে কিছু বলতে হয় না। তানপুরার ধুলো পরিষ্কার করে নিয়ে সে একটির পর একটি গান গায়। এক আশ্চর্য তন্ময়তা

দেখতে পাই তখন তার মধ্যে। সে যেন নিজেকে খুঁজে পায় গানের মধ্যে। অথচ সেই গানই সে ছেড়ে দিয়েছে।

তাকে আমি সঙ্গীতের চর্চা করতে অনুরোধ করি নি। যে বস্তুটিকে সে ত্যাগ করেছে, আমার অনুরোধে তারই সাধনায় ফিরে যাবে—নিজের অনুরোধকে আমি অতটা মূল্যবান মনে করি না। তার গান শুনেছি। গান কেমন লাগলো কোনোদিনই সে জানতে চায় নি; আমিও প্রশংসা করাটাকে বৃথা মনে করেছি।

সুগৃহিণী বলে তার খ্যাতি নেই। কিন্তু আমি যে আতিথেয়তা লাভ করেছি তার কাছে, তার মধ্যে আমার সামান্য সুখসুবিধার প্রতিও নারীর সতর্ক সযত্ন দৃষ্টি দেখেছি। রানু পান খায় না। বাড়িতে পান নেই। অথচ আমি পান খাই বলে নামকরা দোকান থেকে সে লোক পাঠিয়ে পান আনিয়েছে। দুপুরবেলা চা খেতে চাইলে কিছুতেই দেয় নি—নিজের হাতে নেবুর শরবত বানিয়ে দিয়েছে। আমি শুঁটকি মাছের চচ্চড়ি খেতে ভালোবাসি, কথায় কথায় জানতে পেরে, নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছে। বৃহৎ কোনো ব্যাপারই নয়— এইসব। কখনো-বা ছোট্ট—এবং দেখতে খুব সুন্দর একটি কাচের তশতরিতে, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ আর সুপুরি এনে দেয়। তার মধ্যে এক নিবিড় অন্তরঙ্গতা স্তব্ধ হয়ে থাকে।

একদিন তাকে বললাম, তোমার মধ্যে এক আদর্শ স্ত্রী আছে— অথচ?

প্রশ্নটি শুনে তার কর্মরত হাত-পা স্থির হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে নি সে। এক সময় আমার পাশে এসে বসলো। বললো, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন আপনি।

সেই গল্পই লিখতে বসেছি। লিখতে গিয়ে অনেক কিছুই আমাকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে, অনেক প্রশ্ন করতে হয়েছে তাকে, অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনাকে সম্পৃক্ত করতে হয়েছে। তার জীবনে যেসব পাত্রপাত্রী ছায়াপাত করেছে, তাদের কিছুটা দেখেছি, বেশির ভাগই নিজের মতো করে বুঝে নিতে হয়েছে।

গল্প লিখতে বসে আমার একটি বড় সুবিধা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্ন করার স্বাধীনতা লাভ করে তার খুব নিকটে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। সেই সান্নিধ্য লাভের প্রলোভনটাই যে কাহিনী রচনার আসল কারণ নয়—খুব জোর করে সে কথা বলতে পারবো না। তার গোপন কথাগুলো জানতে গিয়ে তার মনের গভীরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সেটাই আমার লাভ।

কিন্তু এ কাহিনী আমার নয়— রানুর। রানুর জীবনের নেপথ্যে আমার একটা কোনো স্থান থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু যেসব ঘটনা রানুকে উদ্বুদ্ধ, উদ্বিগ্ন আর আলোড়িত করেছে সেখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

কাহিনীর নায়ক উমর। তাকেও একজন লেখকরূপে উপস্থিত করলে একটা সুবিধা এই হয় যে, নিজেকে তার ওপর আরোপ করে ঘটনাবলির মধ্যকার গল্পমূল্যটুকু পুরো উসুল করে নেয়া যায়। তাই করেছি। সে আসলে লেখক নয়—

আসলে আমরা অনেকেই অনেক কিছু নই। যেমন, আমার বিশ্বাস, রানুকে সকলে যেমন জানে, সে সেরকম নয়। তাছাড়া, উপন্যাস লিখতে গেলে অনেক কিছুই বানিয়ে নিতে হয়— আমিও এটা বানিয়েই নিলাম। কাহিনীটা বলতে কিছু সুবিধা হবে—তাই। কিন্তু এইসব আরোপিত বস্তুগুলো কাহিনীর পাত্র-পাত্রী এবং মৌল ঘটনাবলির মূল চারিত্র্যকে যেন বিকৃত না করে, সে চেষ্টা অবশ্যই থাকবে।

উপন্যাস উৎসর্গ করবারও একটা নিয়ম আছে। আমার এই উপন্যাস বিনীতভাবে উৎসর্গ করছি কবি আহসান হাবীবকে। কাহিনী প্রায় শুরু হয়ে যাওয়ার পর মাঝখানে হঠাৎ করে উৎসর্গ করাটা নিয়ম নয় জানি। কিন্তু লিখবার সুবিধার জন্য নিয়মগুলোকে একটু-আধটু উল্টেপাল্টে নিলে ক্ষতি কি!

উমর কাজ করছিল। সে এক বিশ্ববিখ্যাত ফারমাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র একজিকিউটিভ। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের হেড; অন্য সমস্ত অধীনস্ত কর্মচারীদের কাজের ভালো-মন্দের শেষ দায়িত্ব তারই। সে সবে এসেছে এই ফার্মে। চাকরি জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে অন্যখানে, যেখানে সুনাম ও সচ্ছলতা দুটোই সে ভোগ করেছে মোটামুটি। এখানে আসবার তেমন কোনো আগ্রহ তার ছিল না; কিন্তু জীবনে মাঝে মাঝে কতকগুলো ঘটনা এমন চটজলদি ঘূর্ণায়িত হতে থাকে যে কী হচ্ছে বুঝবার আগেই যা হওয়ার তা হয়ে যায়। সেভাবেই উমর বলতে গেলে হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করে সে এই নতুন অফিসে নতুন পরিবেশে নতুন দায়িত্ব পালন করছে। উমর ছিল পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের লোক; মার্কেটিংয়ের কাজও তাকে করতে হতো। ফাইন্যান্সের সে কিছুই জানে না। বলেও ছিল সে কথা। কোনো কাজই হয় নি তাতে। কথাটিকে আমলই দেন নি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বলেছিলেন, বেসিক এডুকেশন থাকলে ওটা কোনো বাধাই নয়। দু'দিন একটু দেখে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে যে দুটি বস্তু আবশ্যক তা হচ্ছে সততা আর অভিজ্ঞতা ! একটু অপেক্ষা করে, সিগারে লম্বা টান দিয়ে, তিনি আবার বলেছিলেন, অভিজ্ঞতা আর সততা। তিনি যেন ঠিক করতে পারছেন না, ও দুটোর মধ্যে কোনটার প্রয়োজন আগে।

উমর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বিশেষ প্রিয়পাত্র। সুতরাং জেনারেল ম্যানেজার তাকে সুনজরে দেখেন না। তাই কিছুদিন থেকে উমর তার এক সহকর্মীকে নিয়ে মাঝেমধ্যে মুশকিলে পড়ে। সেই সহকর্মীকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খুব একটা পছন্দ করেন না; এমনকি উমরকে তার ওপর চোখ রাখতে বলেছেন। সুতরাং জেনারেল ম্যানেজার সেই সহকর্মীটিকে পছন্দ করেন। একজন অপছন্দ করলেই আর একজন পছন্দ করবে কিংবা একজন পছন্দ করলেই আর একজন অপছন্দ করবে, এমন অদ্ভুত কথা শুনে পাঠকরা বিস্মিত হবেন না। অনেক অফিসেই এই নিয়মই চলে।

সেই সহকর্মী রোজ একবার স্মরণ করিয়ে দেয়, সিনিয়র অফিসারদের ডিউটি-লিস্টটা অবিলম্বে তৈরি করে না দিলে, রেসপনসিবিলিটি ফিক্স করা যাচ্ছে না। কথাটা যে অভ্রান্ত, উমর তা স্বীকার করে। তবে তার সামান্য আপত্তি আছে ঐ 'অবিলম্বে' শব্দটি সম্পর্কে। সে এখানে এসেছে বেশিদিন হয় নি। বছরের পর বছর ডিউটি-লিস্ট ছাড়াই দিব্যি কাজ চলে গেছে। ঠিক দিব্যি না হলেও, চলে গেছে, আটকে থাকে নি কিছুই। ফলে অবশ্য ইরেগুলারিটির অন্ত নেই। তারই দু'-একটি দিকে উমর যদি তার কোমল আঙুল তুলে দেখিয়েছে, শাফাত আহত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছে, সেভেনটি-থ্রির মাঝামাঝি এয়ারকন্ডিশনড রুমে বসে ওরকম হাইন্ডসাইট সবাই দেখাতে পারে। দেখা যেত সেভেনটি টুর সেই অস্থির চঞ্চল বেপরোয়া দিনগুলোর দায়িত্ব থাকতো যদি কাঁধে। বন্দুক আর স্টেনগান ছাড়া কোনো কথাই তখন বলতো না কাস্টমাররা। আর লেবার—

শাফাত কথা শেষ করতে পারে না। অভিমানে তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। শাফাতের প্রতিক্রিয়া দেখে উমরেরও মনে হয়, সে হয়তো সবকিছু না জেনে শাফাতের ওপর খুব অবিচার করেছে।

উমরকে মানতেই হয়, শাফাতের কথায় যুক্তি আছে। তবু দু'-একটি এমন ব্যাপার আছে। যার সঙ্গে লেবার সিচুয়েশন বা স্টেনগানের কোনো সম্পর্কই নেই। সেদিকে একটু লক্ষ্য রাখলে কোম্পানির হাজার হাজার টাকা বেঁচে যেত। সেই সম্পর্কে উমর দু'একবার খুবই নিরীহভাবে আপত্তি তুলে দেখেছে, কোনো ফল হয় নি।

যাই হোক, ডিউটি-লিস্টটা তৈরি করে ফেলাই ভালো। উমর শুধু জানতে চায়, যে কাজটাকে তোমরা এতই জরুরি মনে করছো এতদিন তা আমার জন্যই ফেলে রেখেছেন কেন?

আজ অফিসে এসেই উমর সেই কাজেই মন দিয়েছে। ডিউটি-লিস্ট তৈরি করে দিলেই সমস্যা অবশ্য মিটে গেল না। সেটি শাফাতের মনের মতো হওয়া চাই। সেই কাজটাই—অর্থাৎ একটা সন্তোষজনক ডিউটি-লিস্টও হবে এবং সেটা শাফাতের অনুমোদনও লাভ করবে,—সেই কাজটাই উমরের কাছে বড়ই দুরূহ মনে হচ্ছে। অপছন্দ হলে পছন্দ হয় আর পছন্দ হলে অপছন্দ হয়— পছন্দ-অপছন্দের এই সম্পর্কের কথাটা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা পুরো সত্য নয়। পছন্দ হলে পছন্দও হয়— যেমন দেখা গেছে, শাফাতের রুচির সঙ্গে জেনারেল ম্যানেজারের রুচির আশ্চর্য মিল আছে। তাদের পছন্দ-অপছন্দ এক।

শাফাত ছেলেটি বেশ টেবিল চাপড়ে কথা বলতে জানে। কোনো এক নীতির প্রশ্নে দ্বিমত হলে সেটা প্রকাশ করবার অধিকার অধস্তন কর্মচারীদেরও আছে। কিন্তু হাতের মুঠি দিয়ে টেবিলের ওপর একটা বিশ্রী আওয়াজ করা তার মধ্যে পড়ে

কিনা উমর মনস্থির করতে পারে নি। কিন্তু সব দেখেশুনে উমরের মনে হচ্ছে, অধস্তনদের এই অধিকারটা তাকে মেনে নিতেই হবে।

শাফাতের আর একটি অভ্যাস আছে। উমরের কাজ বা কথা ভালো না লাগলে প্রতিবারই যে সে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে তা নয়। বৈচিত্র্যের জন্য মুখটি সামান্য নিচু করে আরও সামান্য একটুখানি হাসি হাসে। যেন সে খুব বিনয় করছে। এমনিতেই ছেলেটি সত্যি খুব বিনয়ী। কিন্তু সে যেটা চায় জোর করে আদায় করে নিতে জানে। ঐ সামান্য হাসিটায় অবশ্য বিনয়ের কিছুই নেই। বরং সে বলতে চায়, এই সামান্য ব্যাপারটা যে স্যার কেন বুঝছেন না—আসলে কাজকর্ম তেমন বোঝেন না।

কাজকর্ম অবশ্য উমর ভালোই বোঝে। এমনকি, ফাইন্যান্সের রহস্যটাও সে জেনে ফেলেছে। বি.এ.তে ইকনমিক্স ছিল। প্রথম কয়েক মাস অফিসের পরও ফাইল বাড়ি নিয়ে এসে তাতে মনোযোগ দিয়েছে। রহস্যটা বুঝবার পর লোকজনের ফাঁকিটাও ধরা পড়েছে তার চোখে। অবশ্য, চিরকালই সে তার জ্ঞান আর বিদ্যেটাকে হালকাভাবে বহন করতে ভালোবাসে; অনভিজ্ঞ লোকের মনে হতে পারে, তার জ্ঞান আর বিদ্যের ওজনটাই বুঝি হালকা।

উমর পছন্দ করে শাফাতকে। দোষ-ত্রুটি কিছু কিছু তার থাকতে পারে, সে আর কার থাকে না। বরং একটু দোষ-ত্রুটি থাকলেই মানুষকে উমর মানুষ বলে চিনতে পারে। অবশ্য, দু'-একটি দুর্বলতার কোনো মাফ নেই উমরের কাছে। ছেলেটির বয়স কম, বিয়েশাদী করে নি, বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। প্রধান দোষ দুটি। সে যে সবকিছুই জানে না,—এবং অন্যান্য ব্যক্তিরও সামান্য জ্ঞানগম্যি থাকতে পারে, এটা সে মানে বলে তার আচরণ দেখে মনে হয় না। এবং ছেলেটি যদিও চালাক; কিন্তু সেই চালাকিটা গোপন করতে পারবে অতটা চালাক নয়।

উমরের বিশ্বাস, শাফাতও তাকে পছন্দ করে।

কী কারণে উমর ঠিক জানে না, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছেলেটিকে একেবারেই দেখতে পারেন না। দু'-একবার বলছেনও, ওর ছুটকারা করিয়ে দাও। উমর কিছুতেই রাজি হয় নি। ছেলেটি কাজকর্মে ভালো। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। ছুটকারা করিয়ে দিলে কাজ করবে কে! দুষ্ট লোকেরা বলে ছেলেটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কন্যার প্রতি আসক্ত এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পক্ষে যেটা আরও আপত্তিকর কথা, সেই মেয়েটিও শাফাতের প্রতি অনুরক্তা। লোক আরও বলে, শাফাত একটি ফিল্মে নায়ক হয়েছিল। সেই ছবিটি দেখেই ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মেয়ে প্রেমে পড়ে তার। শাফাতের সেই ছবিটা উমরও দেখেছে। সত্যিই ছেলেটির প্রতিভা আছে। ফিল্মের লাইন সে কেন ছেড়ে দিল কেউ জানে না।

উমর কাজ করছে, এমন সময় অপারেটর ফোনে বললো,—পত্রিকার সম্পাদক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। লাইনটা দেব কি, স্যার?

উমর খুশি হলো। কোনো পত্রিকার সম্পাদকের ফোনই তার কাছে বিশেষ আসে না। দু'-একবার এসেছে, ইন্টারভিউর জন্য। ইন্টারভিউর দায়িত্ব সে নিতে পারে নি। ফার্মের ব্যাপার নিয়ে খবরের কাগজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এখতিয়ার উমরকে দেয়া হয় নি। সে জানে, এ নিয়েও কোনো কোনো কর্মচারী আড়ালে হাসাহাসি করে। স্যারের একেবারে গাটস নেই। সামান্য একটা সাক্ষাৎকার, তা নিয়েও ভীরুতা। ফার্মটা ডুববে দেখছি! উমর খুব মজা পায়। অবশ্য সাক্ষাৎকার না দিয়ে ফার্মকে ডোবাবার সুযোগ খুব বেশি পায় না সে। জেনারেল ম্যানেজার বিদেশে কিংবা ছুটিতে থাকলেই দায়িত্বটা তার কাছে আসে। বলা বাহুল্য, সে কারণে তার জনপ্রিয়তা বাড়ে নি।

কিন্তু আজকে ফোন করেছে বুলবুল আহমেদ। একটা জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের সে সম্পাদক। ছেলেটির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বলতে গেলে হয়ই না। কিন্তু যখন হয়, বুলবুলের মধ্যে অকৃত্রিম সৌজন্য দেখতে পায় উমর। সৌজন্য জিনিসটা আজকাল খুবই দুর্লভ হয়ে গেছে। বুলবুলকে তাই উমরের ভালো লাগে। আগেকার দিনে একটি লোকের অনেকগুলো গুণ না থাকলে সহজে পছন্দ হতে চাইতো না। আজকাল একটি দুটি গুণের জন্যই কৃতজ্ঞ থাকতে হয়।

'আপনার একটা লেখা চাই। ঈদ সংখ্যার জন্য।'

সত্যি কথা বলতে কি, তার কাছে কেউ লেখাটেখা চায় না বলে, উমরের মনে অভিমান আছে; কিন্তু সে তা স্বীকার করবে না। তার বিশ্বাস, অন্য পাঁচজন বিখ্যাত লেখকের তুলনায় তার নিজের লেখা মন্দ নয়। তবে আর সকলের খ্যাতি বাড়তেই থাকে, উমর একজন দর্শকের মতো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কে কে লিখছেন?'

'লিখছেন অনেকেই। কিন্তু আপনার একটা লেখা মাস্ট। আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যে আপনার কাছ থেকেও লেখা পাওয়া সম্ভব!'

'তবু শুনিই না, আর কে কে লিখছেন?'

'সকলেই প্রায়। সরদার জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক...' আরও অনেকের নাম করলো বুলবুল।

'তাঁদের লেখা পেয়ে গেছ?'

'না, এখনো ঠিক হাতে আসে নি। পেয়ে যাবো। আপনার একটা উপন্যাস কিন্তু অবশ্যই চাই।'

সম্পাদকরা অবশ্য ঈদ-সংখ্যার জন্য একটু অস্থির হয়েই পড়েন। বিশেষ করে, হাতে লেখা না থাকলে, লেখকদের যেসব কথা বলেন, তা শুনতে খুব ভালো লাগে। তবু বুলবুলের গলায় আংশিক আন্তরিকতা ছিল। উমর ঠিক করলো, সে লিখবে।

'কিন্তু তোমাদের কাগজে এত ছাপার ভুল থাকে!'

কথাটা শুনে বুলবুল নিশ্চয়ই খুব বিব্রত বোধ করেছিল।

'থাকে— আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু আপনার লেখার প্রুফ দেখার ভার দেব আমাদের সেরা লোককে।'

'শুনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু আমার লেখার ফার্স্ট পেজটা তোমাদের হাপায় থার্ড পেজ হয়ে গেছে অতীতে!'

'আর হবে না, কথা দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। দিন দশেক পর খোঁজ নিও। ভালো আছো? আর হ্যাঁ, আমার নামের বানানটা মনে আছে? ও নয়, উ হবে।'

'কী যে বলেন। দেশসুদ্ধ সবাই জানে!'

'তা জানতে পারে। কিন্তু তোমার ছাপাখানার লোকগুলো জানে না। সম্পাদকরাও না। আচ্ছা, ঠিক আছে। খোঁজ নিও। রাখি।'

উমর ভেবেছিল সেদিন সন্ধ্যা থেকেই লেখাটা শুরু করবে। কিন্তু পারা গেল না। মন খুব খারাপ ছিল। পাঁচটা বাজে। উমর বাড়ি ফিরবে। জেনারেল ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন।

'ডিউটি-লিস্টটা হয়েছে?'

উমর অবাক হলো। ডিউটি-লিস্ট তৈরি হচ্ছে, জেনারেল ম্যানেজারের সেটা জানবার কথা নয়। জানলে উমরও জানাবে। কিন্তু অমন একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করে নি উমর।

'না। হচ্ছে।'

'হুঁ। একটু তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করুন। আর হ্যাঁ, ফাইনালাইজ করবার আগে আমাকে একবার দেখিয়ে নেবেন!'

'আমার ডিপার্টমেন্টের ডিউটি-লিস্টের দায়িত্ব কি আমি একাই নিতে পারি না?'

'পারবেন না কেন! তবে আমারও এক আধটা সাজেশান থাকতে পারে।'

জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে শাফাতও বসেছিল। এটা স্বাভাবিক নয়। জেনারেল ম্যানেজারের কিছু জানবার থাকলে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে উমরকেই জিগ্যেস করবার কথা।

উমর জিগ্যেস করলো, 'আমার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কি আপনার কিছু জানবার আছে?'

'না! একথা কেন বলছেন?'

'শাফাত আপনার চেম্বারে বসে আছে কিনা!'

জেনারেল ম্যানেজার পাইপে তামাক ভরছিলেন। সেইভাবেই বললেন, শাফাত আমার সঙ্গে কাজ নিয়ে আলাপ করতে পারে না?'

'না। আমার মাথা ডিঙিয়ে কিছুতে না।'

হুঁ। আপনি করেন না?'

'কী?'

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে আলাপ?'

'আমার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে তিনি কিছু জিগ্যেস করলে আমি বলেছি। কিন্তু তবু, আপনার জেনারেল পলিসির বিরুদ্ধে আমি কখনো কিছু বলি নি!'

'আহা, রাগ করছেন কেন! শাফাতের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছিল। অফিসের কোনো ব্যাপারই নয়।'

উমর জানে জেনারেল ম্যানেজার উপরঅলা। অফিসের কাজে তাঁর প্রতি বশ্যতা দাবি করবার অধিকার তাঁর আছে। তবু ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে তার কতকগুলো নিজস্ব এলাকা আছে। সেখানে সে সরাসরি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। বলেও কিন্তু সেটাও সে এড়িয়ে চলে।

উমর ফিরে আসছিল।

'একটু দাঁড়ান। আমিও আপনার লেখার একজন ভক্ত পাঠক। কিন্তু অফিস টাইমে সাহিত্যচর্চা করলে ডিসিপ্লিন থাকে না। নিশ্চয়ই আপনিও স্বীকার করবেন।'

'হ্যাঁ করি। কিন্তু কথাটা ওঠে কেন?'

জেনারেল ম্যানেজার আর কিছু বললেন না। কাজে মন দিলেন। উমর হঠাৎ বুঝলো কথাটা। বুলবুলের সঙ্গে টেলিফোনের আলাপটাই তাহলে সাহিত্যচর্চা। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার জানলেন কী করে? শাফাত চুপ করে বসেছিল। তার ওপর চোখ পড়লো উমরের। কী করে জানলেন বুঝলো উমর।

এটাও বুঝলো, এসব কিছুই নয়— গায়ে সুচ ফোটানো। তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

দুই

দশদিন পর খোঁজ নিতে বলেছিল উমর। কিন্তু বুলবুল ফোন করলো দু'দিন পরই।

'আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিলাম।'

'না, না! তার দরকার নেই। বলেছি যখন, চেষ্টা করবোই।'

লেখাটা দিতে হবে বিশ দিনের মধ্যে। এখনো অবশ্য হাতে আঠারো দিন সময় আছে। কিন্তু গত দু'দিন উমর লিখবার জন্য বসতেও পারে নি। বিশ দিন সময় চেয়ে নিয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ জাফরের মতোই অভিজ্ঞতা না হয়!

বুলবুল বললো, একটা সত্যি কথা বলবো? আপনি যে লিখতে রাজি হয়ে যাবেন, ভাবতেই পারি নি! কিন্তু একবার যখন হয়েছেন ছাড়ছি না!

উমর বুঝতে পারলো, সরদার জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক—এঁদের লেখা এখনো বুলবুলের হস্তগত হয় নি!

'তা, তুমি অনেকটা ঠিকই বলেছো। আমি বড্ড কুঁড়ে। লিখবার কথা ভাবলেই ঘুম পায়।'

'আপনি বুঝি খুব ঘুমাতে ভালোবাসেন?'

তা অবশ্য বাসি। কিন্তু অন্য সময় যদি এক ফোঁটাও ঘুম আসে!'

'আপনার নাম করতে ইচ্ছে করে না?'

'আমার নাম বুঝি নেই?'

'ছি ছি, আমি সে কথা বলছি না!'

'না না! তুমি সেকথা বলো নি। বলেছি আমি। কিছুই লিখতে হলো না অথচ নাম হয়ে গেল, আমিও চাই। গল্প লিখছেন কে কে?'

পেয়েছি দু'-একটা। আপনি সাজেস্ট করুন না দু-একটি নাম।'

'আমাকে সাজেস্ট করতে হবে কেন? তুমি জানো না?'

'তবু আপনিও বলুন না!'

এই তো শাহেদ আলী, হাসান আজিজুল হক...

উমর আরও কয়েকটি নাম করলো।

বুলবুল খানিক চুপ করে থাকলো, তারপর বললো, সবার লেখা পাওয়া যায় না!

'একটু চেষ্টা করতে হবে। সবাই তোমার কাছে লেখা পৌঁছে দিয়ে যাবে না!'

'আচ্ছা দেখি। আপনার লেখাটা কিন্তু তৈরি করুন।'

'আচ্ছা আচ্ছা। ব্যস্ত হয়ো না!'

লিখবার জন্য একটি টেবিল দরকার। টেবিল অবশ্য একটা আছে। লিখবারই টেবিল সেটা। অন্তত ছিল তাই। এই ঘরটিতেই উমরের সময় কাটে বেশি। রোজই টেবিলটি চোখে পড়বার কথা। জলজ্যান্ত রাখা আছে একপাশে। কিন্তু বাড়িতে একজন স্ত্রী আছেন, অথচ বহু স্বামীরই যেমন তিনি দৃষ্টিগোচর হন না—এই টেবিলটি সম্পর্কেও উমরের সেই অভিজ্ঞতা। কোথায় বসে একটু লেখা যায় তারই খোঁজ করতে গিয়ে আজই যেন প্রথম টেবিলটি তার চোখে পড়লো। রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়লো, জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়...এই টেবিলে অবশ্য ধুলাটুলা একেবারেই নেই। বরং ঝকঝকে পরিষ্কার। তবু এক অর্থে, লিখবার টেবিল হিসেবে এটির ওপর বহুদিনের ধুলো পুরু হয়ে জমে আছে। উমর লিখতে বসে নি বছরের পর বছর।

বেশ বড় টেবিলটি। তাই অনেক কিছু রাখবার সুবিধা হয়েছে রানুর। দুই পাশে সাময়িক পত্র-পত্রিকার স্তূপ। মাঝখানটা, যেখানে খাতাটি রেখে লিখবার কথা, সেখানে অফিসের ব্রিফকেসটি জায়গা করে নিয়েছে, কারণ বাড়ির আর কোথাও জিনিসটির স্থান হয় নি। যেখানে যেখানে হতে পারতো সেসব জায়গায় ঘি, মাখন, চিনি এইসব দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সযত্নে রাখা হয়েছে এবং কে না জানে সাহিত্যের চাইতে ঐসবের মূল্য অনেক বেশি। ব্রিফকেসটি পেছনে ঠেলে লিখবার একটু জায়গা করে নেব সে উপায়ও নেই। কারণ সেই পেছনটায় রাখা আছে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃহদায়তন দুই খণ্ড শব্দকোষ। সেই পেছনেই দেয়াল ঘেঁসে শব্দকোষের দুইপাশে দেখতে পাবেন একটি রেকর্ড-প্লেয়ার ও একটি টাইপ-রাইটার। রেকর্ড প্লেয়ারটি বাজে না। টাইপ-রাইটারটি বাজে, কিন্তু টাইপ করে না!

রানুকে লিখবার কষ্টের কথা বলে লাভ নেই। সে কী বলবে উমর জানে। সত্যিই তো, টেবিলটি নামেই লিখবার টেবিল। তাছাড়া, জিনিসগুলো রাখবার জন্য তো একটা জায়গা চাই।

তবু দু'-একটি জিনিস সরিয়ে লিখবার একটু জায়গা না হয় করেই নিল উমর। কিন্তু চেয়ারটির সমস্যা মিটবে কেমন করে? চেয়ারটির উচ্চতা এবং টেবিলটির নিম্নতার মধ্যে এমন দূরত্ব আছে যে লিখতে বসলেই উমরের মনে হয়, সে দোতলায় বসে একতলার ব্যালকনিতে হাত রাখতে চেষ্টা করছে।

আরো অসুবিধা আছে। টেবিলটি পাতা আছে কামরাটির দক্ষিণ দিকের একটি কোণে। দক্ষিণ দিকটা অবশ্য সাহিত্যে একটি বিখ্যাত দিক। কিন্তু যে কক্ষটির অবস্থানই উত্তর দিকে তার দক্ষিণটা অত সুখ্যাতি দাবি করতে পারে কিনা কে জানে। কোনো জানালা-টানালাও নেই সে দেয়ালে। আছে শুধু একটি দেয়াল। চেয়ারটিতে বসলেই দেয়ালটি ধাক্কা মারে চোখে। হাঁ করে গিলতে আসে যেন। উমরের দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ডস্টয়ভস্কি সম্পর্কে উমর একটি কথা পড়েছিল। একটি বাড়ির নকশা বানিয়েছিলেন তিনি—তার কোনো দরজা-জানালা নেই। লিখবার এই চেয়ারটিতে বসলেই উমরের মনে হয়, ডস্টয়ভস্কির তৈরি সেই ঘরে সে বাস করছে।

পুব দিকেও একটা জানালা আছে। টেবিলটি স্বচ্ছন্দে সেখানেও পাতা যেত। উমর লিখতো, মাঝে মাঝে খোলা আকাশটাকে একবার দেখে নিত। কিন্তু সকালের রোদে স্বামীর কষ্ট হবে বলেই হয়তো রানু টেবিলটি সেখানে রাখে নি। ভালোই করেছে। একতলাটার কলতলা আবার এই পুবের জানালা দিয়ে দেখা যায়। একতলার ঝি দুটি আবার সেখানে বসেই গা ধোয়। এদিকে টেবিল রাখলে উমর দেখবে না লিখবে। লিখতে বসে উমরের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হোক, স্ত্রী হয়ে রানু তো আর তা চাইতে পারে না!

পশ্চিম দিকটা দখল করে আছে শোবার খাট। সেখানে টেবিল পাতবার জায়গা নেই।

বাকি রইলো উত্তর। মাঝখানে একটা বড় জানালা। একপাশে ওয়ারড্রোব, অন্যপাশে বইয়ের আলমারি। টেবিল রাখবার আদর্শ স্থান এটাই। জানালা দিয়ে সুপুরি আর নারকেল গাছের সারি দেখা যায়। এইখানেই টেবিলটি রাখতে বলেছিল উমর, তার লিখার সুবিধা হবে বলে।

কথাটা শুনে রানু একটুখানি হেসেছিল—বড়ই মর্মান্তিক সে হাসি। লিখতে জানলে না কি সবখানে বসেই লেখা যায়। রানুর কথাটা শুনে উমরের ভালো লাগবার কথা নয়, লাগেও নি। সেও বলতে চেয়েছিল লেখাটা বসে বসে ঠোঁটে লিপস্টিক মাখার মতো একটা ব্যাপার নয়। কিন্তু ঠিক সময় সুবুদ্ধি হলো বলে উমর শেষ পর্যন্ত কথাটা বলে নি। রানু নির্ঘাত মনে করতো, সে ঠিক কথা বলেছে বলেই উমর রাগ করেছে।

উমর অবশ্য খুব আস্থার সঙ্গে বলতে পারবে না, সে লেখক কিনা। তবে লেখক জীবনের শতেক দুর্গতির কথা সে জানে। সার্থকতাও যে একেবারেই নেই তা নয়। কত টেলিফোন আসে, চিঠি আসে, কত মেয়ে অনুরোধ করে তার জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতে। নিউমার্কেটে সাবান কিনতে গেলে ইউনিভার্সিটির মেয়েরা আঙুল তুলে দেখায়। এসব কি কিছু কম। উমরের এক বন্ধু তো একটি উপন্যাস লিখে রাজকন্যা লাভ করলো। রাজকন্যা অবশ্য নয়। একজন অধ্যাপিকা। বন্ধুর সেই উপন্যাসটি অবশ্য বিক্রি হয় নি। কিন্তু সেই অধ্যাপিকা মহিলাটি উপন্যাস পাঠ করে এতই মুগ্ধ যে প্রায় স্বয়ম্বরা হয়ে বন্ধুটিকে বিয়ে করলেন। বন্ধুটি ভালোই আছেন। কাজকর্ম করতে হয় না। তবু যে কেন লেখকদের মুখে সবসময় শোকগাথা!

উমরের জীবনে এসব রোমাঞ্চকর ঘটনা কিছুই ঘটে নি। কোনো পাঠিকার একটি চিঠি পর্যন্ত পায় নি। একবার শুধু তার একটি মধুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

অনেক বছর আগেকার কথা। উমর খুলনা থেকে নারায়ণগঞ্জ আসছে স্টিমারে। বরিশালে জাহাজ ভিড়লো। কেবিন থেকে নদীর ঢেউ গুণে গুণে উমর ক্লান্ত হয়ে গেছে। লোকজনের ওঠানামা দেখবার জন্য ডেকে এসে দাঁড়ালো। কুলিদের দৌড়-ঝাঁপ, যাত্রীদের ব্যস্ততা, মাছভরা নৌকো নিয়ে জেলেদের স্টিমারের গায়ে ভিড়ে পড়া, একটি ছেলে বই বিক্রি করছে, 'গোপন কথা' বইটি নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানো— এসব দেখতে পাবেই উমর জানতো। ঘাটে দুটি লোকের মধ্যে কী কারণে যেন হাতাহাতি শুরু হয়ে গেছে, কেউ তাদের রোধ করতে চেষ্টা করছে না, বরং একঘেঁয়ে জীবনে তবু সামান্য একটা উত্তেজনা হিসেবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলে তাই দেখছে। হঠাৎ একটি মেয়ের ওপর চোখ পড়লো। আজকালকার কোনো মেয়ের মাথায় অত চুল দেখা যায় না।

সাধুসন্তদের মাথা ঘিরে একটা আলোর বৃত্ত থাকে। এই মেয়েটির মাথায় তেমনি মেঘের মতো চুল। গায়ে নীল রঙের একটি সাধারণ টাঙ্গাইল শাড়ি ব্লাউজটার রঙ ঘিয়ের মতো, রেশমেরই মনে হচ্ছে এবং সেটির হাতার কানায় জরির কাজ। মেয়েটি এইমাত্র সেতুর মতো কাঠের তক্তাটি পার হয়ে স্টিমারে পা দিল। অমনি স্টিমারটি একটি মায়াপুরী হয়ে গেল উমরের চোখে।

উমরকে দোষ দেয়া যায় না। তখন তার বয়স কম, বিয়ে হয় নি, নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, যে মেয়েকে চোখে পড়ে তারই মধ্যে এক প্রেয়সী খোঁজে। এ তো আছেই, তার ওপর যেটা ছিল তা হচ্ছে এই যে মেয়েটি বাস্তবিকই সুন্দরী। শুধু সুন্দরী তাই নয়, তা অনেকেই হয়; মানে, চোখ নাক কান মুখের গড়ন যাদের অনিন্দ্য। এ মেয়েটি কেবল সুন্দরীই নয়— দেখতে ভালো। রূপ চঞ্চল হয়ে ঠিকরাচ্ছে না এর দেহে—স্তব্ধ হয়ে আছে। এ ধরনের রূপ সম্ভ্রম জাগায়।

এক ভদ্রলোক মেয়েটির সঙ্গে জাহাজে উঠলেন। বেঁটেখাটো লোকটি, গায়ের রঙ বেশ ময়লা, মাথায় কদমছাঁট চুল, গায়ে একটা ফতুয়া, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। উমরের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হলো। এই ভদ্রলোকটিই মেয়েটির স্বামী নাকি! এমনও হয়— সে অবশ্য দেখে নি এখনো, কিন্তু শুনেছে।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দু'জনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু কথা হলো। আলাপের ধরনে বোঝা গেল, সেই ভদ্রলোক অভিভাবক স্থানীয় কেউ হবেন। কিন্তু স্বামী নন। জাহাজ ছাড়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন না। চলে গেলেন। মেয়েটিও তার কেবিনে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। কী পরমাশ্চর্য সুষমা তার পা ফেলার ছন্দে!

উমরের কেবিন মেয়েটির মুখোমুখি। উমরও দরজা আটকে দিয়েছে। জাহাজে এক আসনের এই দুটি মাত্র কেবিনই আছে। উমর কিছু পড়তে চেষ্টা করছে, মেয়েটি এখন করছে কী? একথাও মনে হচ্ছে তার, ঐ মেয়েটির মতো মেয়ে যদি আছে পৃথিবীতে, তাহলে মানব সংসারের চেহারাটা সব দিক দিয়েই এমন শ্রীহীন কেন!

উমরের তখন সেই বয়স যখন এ-কথা ভাবতেও তার ভালো লাগছে যে দুটি মুখোমুখি কেবিনে তারা বসে আছে।

উমর খুব আশা করেছিল মেয়েটি দুপুরে খেতে আসবে ডাইনিং হলে। সে সকাল থেকে দাড়ি কামায় নি, চুল আঁচড়ায় নি, পরিষ্কার জামাকাপড় পরে নি। সে তো আর জানতো না বরিশাল ঘাট থেকে অমন একটি মেয়ে জাহাজে উঠবে। তাকে প্রচুর ট্যুর করতে হয়। কিন্তু কখনো এমন মেয়ের দেখা পায় নি। বইয়ে অবশ্য অনেক পড়েছে এই ধরনের স্মরণীয় দেখা-সাক্ষাতের কথা; কিন্তু বইয়ের ক'টি কথা আর সত্য হয়? যাই হোক, এখন সে সকালবেলার সব ত্রুটিই শুধরে

নিয়ে ডাইনিং হলে বসে আছে। সে কিন্তু এলো না। কেবিনে খাবার আনিয়ে নিল।

উমরও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের কেবিনে ফিরে এলো। দেখা হলেও মেয়েটি যে তাকে কোনো গুরুত্বই দেবে না, উমর ততক্ষণে সেই কথাটা বুঝে ফেলেছে। বুঝে ফেলবার পরমুহূর্তেই নিজেকে খুব নির্ভার আর মুক্ত মনে হলো উমরের। বিছানায় শরীর স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

স্টিমারটি রকেট সার্ভিস। নদী কেটে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে; নারায়ণগঞ্জ এখন খুব দূর নয়।

উমরের যখন ঘুম ভাঙলো, বিকেল হয়ে এসেছে। কেবিনে বন্দি হয়ে থাকতে ভালো লাগে না। তাছাড়া, ডেকে ফুরফুরে হাওয়া—আসলে হাওয়ার তেজ ফুরফুরের চাইতে অনেক বেশি,—এবং বসবার জন্য আরামদায়ক চেয়ার পাতা আছে। উমর বেরিয়ে এলো।

মেয়েটিও একটি চেয়ারে বসে আছে। আর কেউ নেই। অনেক যাত্রী ছিল। এখন কিন্তু একেবারে ফাঁকা। আর সকলে নিশ্চয়ই চাঁদপুরে নেবে গেছে। এটা খুব স্বাভাবিক বা সাধারণ নয়। কিন্তু লোকে যাই বলুক, মাঝে-মধ্যে এমন অভিজ্ঞতাও হয়।

উমরও একটি চেয়ার টেনে অদূরে বসে পড়লো।

মেয়েটি খুব মনোযোগ দিয়ে একটি পত্রিকা পাঠ করছে। পত্রিকাটি দেখেই চিনলো উমর। সেটি একটি বিশেষ সংখ্যা। উমরের একটি দীর্ঘ গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেই সংখ্যায়।

এখন যে কথাটি বলবে উমর, একটা বড় রকম ঝুঁকি নিয়ে বলতে হবে সে কথা। লোকে বলে, যে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, তা সত্য হলেও বলতে নেই। একটি পত্রিকায় উমরের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, এবং স্টিমারে এক সুন্দরী মেয়ের হাতে সেই পত্রিকা—মাত্র এইটুকুর মধ্যে সম্ভবত বিশ্বাসের অতীত কিছুই নেই। যে সত্যটি বলবার জন্য একটু সাহস দরকার, সে অন্য কথা।

কথাটি এই, উমরের নির্ভুল মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্তে মেয়েটি তার গল্পটাই পাঠ করছে। মনে করবার খুব একটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, তা নয়। কিন্তু তবু উমরের মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর সবকিছুই ওলটপালট হয়ে যেতে পারে; কিন্তু তার এই বিশ্বাসটা মিথ্যা হবে না। সেই মুহূর্তটির পরিবেশে এমন কোনো বীজ ছিল, কিংবা ছিল বলেই উমরের ধারণা হয়েছিল, যা সেই বিশ্বাসটি তার মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। কোনো যুক্তি খুঁজতে গেলে, একটিমাত্র কথাই ভাবতে পারে উমর।

গল্পটি পাঠ করবার সময় মেয়েটির চোখে-মুখে যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল উমর গল্পটির মধ্যেই ছিল সেই ভাবের উৎস। এছাড়া, অন্য কোনো কারণের কথা উমর